দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... JUL. 1 .. 1999
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৮

ঢাকা বৃহস্পতিবার ১ জুলাই ১৯৯৯

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৭৮তম প্রতি

উপেক্ষিত প্রতিষ্ঠাতা

মুনশী আবদুল মান্নান

নবাব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী যথেষ্ট আলোচিত নন। এখনও তিনি অপরিচয়ের অন্ধকারেই রয়ে গেছেন। কেন, তার কারণ অনির্ণীত। সম্ভাব্য একটি কারণ এই হতে পারে যে, তার বংশধরগণ এমন কোন উদ্যোগ বা পদক্ষেপ নেননি যাতে তার সম্পর্কে দেশবাসী অবহিত হতে পারে। দ্বিতীয় কারণ সম্ভবত এই যে, বাংলাদেশের বিদ্যুৎসমাজ বিশেষ করে লেখক-গবেষকগণ তাঁর জীবন, কর্ম ও অবদান সম্পর্কে গবেষণায় আগ্রহ প্রদর্শন করেননি। সবচেয়ে বড় কথা বাংলার যে মুসলিম সমাজের আত্মপ্রতিষ্ঠা, উন্নয়ন ও কল্যাণব্রতে তিনি জীবনকে নিয়োজিত করেছিলেন সেই মুসলিম সমাজ ও রাষ্ট্র শক্তি তাঁর প্রতি চরম অবহেলা প্রদর্শন করেছে। হয়তো বা এক ধরনের রাজনীতিরও তিনি শিকার হয়েছেন।

বাংলার, বিশেষ করে তৎকালীন পূর্ব বাংলার মানুষের সার্বিক উজ্জীবন, উন্নয়ন ও অগ্রগতিতে এ অঞ্চলের মুসলিম নবাব ও জমিদারদের অগ্রবর্তী ভূমিকা ও অবদানের কথা কারো অজানা থাকার নয়। অথচ '৪৭ পরবর্তীকালে কূটিল রাজনীতি এই নবাব জমিদারের স্মরণীয় ভূমিকা ও অবদানকে কেবল অস্বীকার করেনি তাদেরকে রীতিমত ভিলেন হিসেবে উপস্থাপিত করেছে। গণকল্যাণব্রতীদের গণশত্রু ও শোষক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই অপরাজনীতি মুসলিম নব জাগরণের অগ্রদূত নবাব খাজা সলিমুল্লাহকে পর্যন্ত আমলে না আনার ধৃষ্টতা প্রদর্শন করেছে। বোধকরি এসব কারণেই নবাব খাজা সলিমুল্লাহ ও নবাব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরীর মত প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তিরা ইতিহাসের জীর্ণ পাতায় স্থান লাভ করেন, নতুন প্রেক্ষিতে ও পর্যায়ে তাদের জনসমক্ষে তুলে ধরার কাজটি আর হয়নি।

তিনি, নবাব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী ছিলেন দু'জনের মধ্যে দ্বিতীয়। প্রথমজন অবশ্যই নবাব খাজা সলিমুল্লাহ। গত শতকের শেষ দশক থেকে বর্তমান শতকের তিন দশক এই একটানা ৪০ বছর বাংলার মুসলমানদের রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষা, সাহিত্য, সাংবাদিকতা, সংস্কৃতি প্রভৃতি প্রতিটি ক্ষেত্রে নবাব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী ছিলেন অন্যতম শীর্ষ নেতা। নবাব খাজা সলিমুল্লাহর মৃত্যু পর্যন্ত তিনি ছিলেন কার্যত দ্বিতীয় প্রধান নেতা। তার ইন্তেকালের পর তিনি ছিলেন প্রধান নেতা। আমৃত্যু নেতৃত্বের এই শীর্ষ আসনেই তিনি সমাসীন ছিলেন। বাংলার বিশেষ করে তৎকালীন পূর্ব বাংলার মানুষের অধিকার ও স্বার্থের প্রশ্নে নবাব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী ছিলেন অটল ও নিরাপস। ১৯৪৮ থেকে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনের কথা আমরা কম-বেশী সবাই জানি। কিন্তু এটা অনেকেই জানি না যে, এরও অনেক আগে নবাব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী শিক্ষার বাহন হিসেবে বাংলার দাবী উত্থাপন করেছিলেন। সম্ভবত তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি এই দাবী প্রস্তাবাকারে তুলে ধরেছিলেন। বাংলা ভাষাভাষী মুসলমানদের বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সাংবাদিকতা চর্চার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অন্যতম অনুপ্রেরণাদাতা ও সহায়তাকারী। বঙ্গভঙ্গের পক্ষে তিনি ছিলেন আপসহীন সংগ্রামী। ১৯০৫

নওয়াব সলিমুল্লাহ

সালে ঢাকায় ভারতীয় মুসলমানদের প্রথম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান মুসলিম লীগের তিনি ছিলেন অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। বাংলা ভাষী মুসলমানদের শিক্ষার অধিকার ও আন্দোলনে তিনি ছিলেন পুরোধা পুরুষ। ১৯১২ সালের ১২ ডিসেম্বর যখন বঙ্গভঙ্গ রদ ঘোষিত হয় তখন সবচেয়ে বেশী যারা এতে আহত হন তাদের মধ্যে নবাব খাজা সলিমুল্লাহর পরেই নবাব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরীর নাম উল্লেখযোগ্য। বঙ্গভঙ্গ ছিল পূর্ব বাংলার মুসলমানদের সর্বমুখী মুক্তির নির্দেশনাদানকারী ঐতিহাসিক ঘটনা। তৎকালীন মুসলিম নেতৃত্ব বঙ্গভঙ্গ বহাল রাখার পক্ষে আন্দোলন করেছিলেন, যার অন্যতম নেতা ছিলেন নবাব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী। তিনি বিশ্বাস করতেন, পূর্ববঙ্গ ও আসাম নিয়ে গঠিত নতুন প্রদেশ মুসলমানদের এবং একই সঙ্গে পূর্ব বাংলার স্বার্থে অপরিহার্য। তাঁর এ গভীর বিশ্বাসের কথা তিনি ১৯১৮ সালে ৬ ফেব্রুয়ারী কেন্দ্রীয় আইন সভায় দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর ভাষায়ঃ পূর্ব বাংলাকে পশ্চিম বাংলার সঙ্গে যুক্ত রাখা হলে পূর্ব বাংলার স্বার্থ অনেকাংশে ক্ষুণ্ণ হবে। সুতরাং ভবিষ্যতে যদি কোনদিন প্রাদেশিক সীমারেখা পুনঃনির্ধারণের প্রশ্ন ওঠে তবে পূর্ব বাংলাকে যেন সিলেট জেলাসহ একটি স্বতন্ত্র শাসনতান্ত্রিক ইউনিটে পরিণত করা হয়। উল্লেখ্য, বাহুল্য, ১৯৪৭ সালে সিলেটসহ পূর্ব বাংলাকে নিয়েই পূর্ব পাকিস্তান গঠিত হয় যা ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশে পরিণত হয়েছে।

মুসলমানদের শিক্ষার অধিকার ও আন্দোলনে নবাব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরীর ভূমিকা ও অবদান সংক্ষিপ্ত পরিসরে মূল্যায়ন করা সম্ভব নয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় তার নিরবচ্ছিন্ন প্রয়াসের কথা উল্লেখ করলেই তার ভূমিকা ও অবদান সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করা যাবে। পূর্ব বাংলার মুসলিম নেতৃত্বের পক্ষ থেকে ঢাকায় একটি পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবী আগেই করা হয়েছিল। কিন্তু তা তৎকালীন ভারত সরকার বিবেচনায় আনার প্রয়োজনবোধ করেনি। বঙ্গভঙ্গের মাধ্যমে যে নতুন প্রদেশ গঠিত হয় তার রাজধানী হয় ঢাকায়। সঙ্গত কারণেই এটাই ছিল প্রত্যাশিত যে, নতুন প্রদেশের হাইকোর্ট ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিতসহ প্রাদেশিক সকল স্থাপনা ও সুযোগ-সুবিধাই ঢাকায় নিশ্চিত করা হবে। কিন্তু কংগ্রেস ও হিন্দু নেতৃবৃন্দের বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন ও ষড়যন্ত্রের কারণে শেষ পর্যন্ত বঙ্গভঙ্গ রদ হয়ে যায়। এর ফলে পূর্ববঙ্গে ব্যাপক ক্ষোভ ও অসন্তোষ দেখা দেয়। এই ক্ষোভ-অসন্তোষ প্রশমনের জন্য তৎকালীন গভর্নর জেনারেল লর্ড হার্ডিঞ্জ ১৯১২ সালের ২৯ জানুয়ারী তিনদিনের সফরে ঢাকা আসেন। তার উদ্দেশ্য ছিল ঢাকায় মুসলিম নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সরাসরি কথাবার্তা বলে পরিবর্তিত সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাদের রাজি করানো। ৩১ জানুয়ারী নবাব খাজা সলিমুল্লাহর নেতৃত্বে ১৯ সদস্যের এক প্রতিনিধি দল গভর্নর জেনারেলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। প্রতিনিধি দলের পক্ষ থেকে গভর্নর জেনারেলকে একটি মানপত্র প্রদান করা হয়। মানপত্রে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবী

নবাব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী

জানানো হয়। উল্লেখ্য, ঐ প্রতিনিধি দলে নবাব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী, শেরে বাংলা (পরবর্তীতে) একে ফজলুল হকও ছিলেন। মানপত্রের জবাবে লর্ড হার্ডিঞ্জ ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ঘোষণা প্রদান করেন। ১৯১২ সালের ফেব্রুয়ারীতে ভারত সরকার বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব অনুমোদন করে। স্মরণ করা যেতে পারে, ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব পাস হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু নেতৃবৃন্দ এর প্রতিবাদে আন্দোলন শুরু করেন। তারা এই মর্মে অভিযোগ করেন যে, এর ফলে বাঙালী জাতি বিভক্ত হয়ে পড়বে এবং হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ আরও বাড়বে। হিন্দু নেতৃবৃন্দ সারা বাংলায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রতিবাদে সভা সমাবেশের আয়োজন করে। ১০ ফেব্রুয়ারী ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, ফরিদপুর ও মোমেনশাহীতে সভা-সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। ১২ ফেব্রুয়ারী বর্ধমানের রাসবিহারী ঘোষের নেতৃত্বে হিন্দু নেতৃবৃন্দের এক প্রতিনিধি দল গভর্নর জেনারেলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। প্রতিনিধি দলের পক্ষ থেকে বলা হয়, ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা আভ্যন্তরীণভাবে বঙ্গ বিভাগের সমতুল্য। তাছাড়া পূর্ববঙ্গের লোক প্রধানত কৃষক, তাই এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা তাদের কোন উপকারে আসবে না। এর পরও তাদের আন্দোলন অব্যাহত থাকে। ভারত সরকারের পক্ষ থেকে যুদ্ধ এবং অর্থ সংকটের কথা বলে বিশ্ববিদ্যালয় বাস্তবায়ন আটকে রাখা হয়। এই দীর্ঘসূত্রতার প্রতিবাদ জানান নবাব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী। ১৯১৬ সালের ৩০-৩১ ডিসেম্বর লক্ষ্ণৌতে মুসলিম লীগের নবম অধিবেশনে প্রদত্ত ভাষণে তিনি ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জোর দাবী জানিয়ে বলেন, ৫ বছর কেটে গেল, যুদ্ধ ও আর্থিক সংকটের অজুহাতে তার (লর্ড হার্ডিঞ্জ) প্রতিশ্রুত বিশ্ববিদ্যালয়টি এখনও প্রতিষ্ঠিত হল না। অথচ এই সংকটের মধ্যেও পাটনায় হাইকোর্ট ও বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা সম্ভব হল। এর পরও কোন অগ্রগতি না হওয়ায় ১৯১৭ সালের ৭ মার্চ নবাব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী ইম্পেরিয়াল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে পুনরায় ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব উত্থাপন করেন এবং ২০ মার্চের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা বিল পাসের দাবী জানান। তার প্রস্তাব ও দাবীর প্রেক্ষিতে কাউন্সিল জানায়, বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার খসড়া বিল তৈরী হয়েছে। যুদ্ধের পর যথাসময়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হবে। ১৯১৭ সালে এ ব্যাপারে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন গঠন করা হয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত নাথান কমিটির রিপোর্ট ঐ কমিশন অনুমোদন করে। অতঃপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এ্যাক্ট পাস হয়। এই এ্যাক্টের ভিত্তিতেই ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐ বছর জুলাইয়ে নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস শুরু হয়। বলা বিশেষভাবে আবশ্যক যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য নবাব খাজা সলিমুল্লাহ আগেই কয়েকশ' বিঘা জমি দান করেছিলেন। প্রতিষ্ঠালগ্নে নবাব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী তার জমিদারীর একাংশ বন্ধক রেখে বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য নগদ টাকার যোগান দিয়েছিলেন। বলার অপেক্ষা রাখে না, নবাব খাজা সলিমুল্লাহর আকস্মিক মৃত্যুর পর বিশ্ববিদ্যালয় আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন নবাব সৈয়দ নওয়াব আলী

শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক

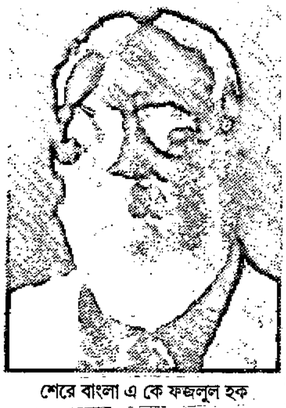

চৌধুরী। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় তার অবদানের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে খান বাহাদুর খাজা মোহাম্মদ আজম যথার্থই বলেছেন, তার অবিরাম চেষ্টা না হলে হয়তো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অস্তিত্বই লাভ করতো না।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই কার্যকর প্রতিষ্ঠাতা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েই চরমভাবে উপেক্ষিত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দিবসে তার নাম খুব কমই উচ্চারিত হয়। আজ পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তার নামে একটি হল বা রাস্তা পর্যন্ত হয়নি। অবহেলা-উপেক্ষা এবং অকৃতজ্ঞতার এর চেয়ে বড় নজির হতে পারে কিনা আমাদের জানা নেই। নবাব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী আমাদের মাঝ থেকে অনেক আগেই বিদায় নিয়েছেন। তাকে স্মরণ করলে, তার অবদানের কথা উচ্চারণ করলে তার কোন লাভ হবে কিনা আমরা জানি না। কিন্তু আমাদের লাভ হবে। তাঁর জীবন ও কর্ম সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারলে এদেশের নতুন প্রজন্ম তাদের পূর্বপুরুষদের সংগ্রামের ইতিহাস জানতে পারবে যা বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নির্মাণে তাদের বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করতে পারবে।